ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে প্রস্তাবনা বলতে সংবিধানের কার্যকরী অংশের মুখবন্ধ বা ভূমিকাকে বোঝায়। প্রস্তাবনা থেকে সংবিধানের আদর্শগত ভিত্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম অনুমোদনের প্রকৃতি, সরকারী কাঠামোর বিবরণ-বিবরণ, সংবিধানের লক্ষ্য, আদর্শ উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায়। অর্থাৎ প্রস্তাবনা হল সংবিধানের অন্তরাত্মা বা নির্যাসস্বরূপ, যার দ্বারা সংবিধানের রচয়িতাদের ইচ্ছা, সংবিধানের উৎস এবং সংবিধানের আইনগত, দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

~~ভারতীয়~~

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় তার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা মূলত দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। এর প্রথম অংশে রয়েছে সংবিধানের উৎস এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে উল্লেখ করা হল।

" আমরা, ভারতের জনগন, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ন্যায় বিচার, চিন্তার, অভিব্যক্তির বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি- মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাস ভ্রাতৃভাব বর্ধিত- হয়।

অদ্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের গণ
সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬ শে নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।”

সংবিধানের প্রস্তাবনা উদ্ধৃত করার পর এর বিভিন্ন অংশের তাৎপর্যকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(১) <u>আমরা ভারতের জনগণ</u> – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনার ন্যায় ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও একথা বলা হয়েছে যে, ভারতের জনগণ এই সংবিধান বিধিবদ্ধ করেছেন এবং নিজেদের অর্পণ করেছেন। এর তাৎপর্য হল, গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ ব্যক্তি হিসেবে নয়, সমগ্র ভারতবাসীর নামে এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজ করেছেন।

(২) <u>সার্বভৌম</u> – প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার দুটি দিক রয়েছে, যথা – (ক) আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা এবং (খ) বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুই দিক থেকেই ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। কারণ ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ভারতরাষ্ট্রের আইন চূড়ান্ত। যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য। অনুরূপভাবে বাহ্যিক ক্ষেত্রেও ভারত সার্বভৌম। কারণ কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র বা সংস্থার নির্দেশে ভারত রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকার স্বাধীন ভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে।

(৩) সমাজতান্ত্রিক — সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবেই যে, প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত শব্দটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিভিন্ন দিক রয়েছে। ভারত কি ধরনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে, তাঁর কোন ইঙ্গিত সংবিধানে নেই। তবে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে সংশোধিত নির্দেশাত্মক নীতি সমূহের বিশ্লেষণ থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, ভারতবর্ষ বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র বা গনতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। ~~অর্থ~~ অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ পথে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণ সমূহের উপর ধীরে ধীরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা হল ভারত রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

তবে সম্প্রতি ভারতে একদিকে বেসরকারীকরণ এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ব্যবস্থার নীতি যেভাবে অনুসৃত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবনায় ঘোষিত এই লক্ষ্যটির আদৌ কোন তাৎপর্য আছে কি না — এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষ — ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা কোন বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না, কিংবা বিশেষ কোন ধর্মের বিরোধিতা করে না। এরূপ রাষ্ট্রে ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের মধ্যে যেমন কোন রূপ পার্থক্যমূলক আচরণ করা হয় না,

তেমনি প্রতিটি ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ, ধর্ম আচরণ এবং ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হয়।

(৫) গণতান্ত্রিক – প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে নির্দিষ্ট সময়ান্তের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচক মন্ডলী রাষ্ট্র পরিচালকদের নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হল মহান আর্থ-সামাজিক আদর্শ। এর লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগ প্রদান করা। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণতন্ত্র শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) সাধারণতন্ত্র – প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি "সাধারণতন্ত্র" বলে ঘোষণা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে 'গণতন্ত্র' এবং 'সাধারণতন্ত্র' শব্দ দুটিকে সমার্থক বলে মনে হলেও উভয়ের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন সরকারীপদ বংশানুক্রমিক ভাবে কারো জন্য সংরক্ষিত নয়। যোগ্যতাসম্পন্ন সকল নাগরিকদের পক্ষেই এই পদগুলিতে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব :- সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সমূহ হল –

(১) সংবিধানের নৈতিক চেতনা – প্রস্তাবনা হল একটি দৃঢ় সংকল্প বা অভিপ্রায়, একটি প্রতিশ্রুতি, একটি শপথের এবং কর্মভার, যা ভারতের পুনর্জন্মকে সুনিশ্চিত করেছে। কারণ প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের ~~দর্শনের~~ দর্শন, উদ্দেশ্য সমূহ এবং

ধারণাসমূহ বা আদর্শসমূহ চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই প্রস্তাবনাকে সং বিধানের নৈতিক চেতনা বা বিবেকবুদ্ধি বলা হয়। অর্থাৎ, "The Preamble is the Conscience of the Constitution".

(২) সংবিধানের প্রধান সুর : প্রস্তাবনা হল সংবিধানের মূল সুর। সংবিধানের ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার বিশেষ ~~সাহায্য~~ সাহায্য নেওয়া হয়।

(৩) সংবিধানের মহামূল্যবান অংশ, আত্মা ও চাবিকাঠি:- প্রস্তাবনা হল সংবিধানের একটি সর্বাপেক্ষা মহামূল্যবান অংশ - সংবিধানের আত্মা, সংবিধানের চাবিকাঠি - যার মাধ্যমে সংবিধানের মূল্য, উৎকর্ষ, গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়।

(৪) সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি - ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা হল এর দার্শনিক ভিত্তি, যার মাধ্যমে সংবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ও নীতিসমূহ সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান প্রণয়নের সময় যে সব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রকাশ প্রস্তাবনার মধ্যে হয়েছে।

(৫) সংবিধানের বৈধ গুরুত্ব :- প্রস্তাবনা সংবিধানের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এটি কখনোই প্রকৃত ক্ষমতার উৎস বলে ~~কিছে~~ বিবেচিত হয় না। কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রস্তাবনা হল সংবিধানের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ, সংবিধানের সার এবং একটি রাজনৈতিক জাতপত্রিকা।

(৬) আন্তর্জাতিক গুরুত্ব :- সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভ্রাতৃত্ববোধ শব্দটির দ্বারা একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা বলা হয়েছে

অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক সমাজের সকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহানুভূতিমূলক ও সাহচর্যমূলক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।